রথীন্দ্রনাথ : বহুবর্ণিল শিল্পীসত্ত্বা

রথীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির এই কৃতীসন্তান হারিয়ে গেছেন তাঁর পিতার ছায়ায়। এই মানুষটিকে খোঁজার চেষ্টায় শুভজিৎ সরকার।

বর্তমান কালের ফেসবুকের মতো জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কৃতীরা 'পারিবারিক খাতা'-তে লিখে রাখতেন নিজ নিজ চিন্তাভাবনা, মন্তব্য। রাম জন্মের আগে যেমন *রামায়ণ* রচনা, রথীন্দ্রনাথের জন্মের আগে থেকেই তাঁকে নিয়ে তেমনি জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছিল, যা দেখে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন – 'আজকালকার ছেলেদের মান কত। আমাদের কালের ছেলেদের Biography মরবার পর লেখা (হ'ত এখন হয়) জন্মাবার আগে।' রথীন্দ্রনাথের জ্যাঠতুতো দাদা হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর পারিবারিক খাতায় রথীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন – 'রবিকাকার একটী মাণ্যবান ও সৌভাগ্যবান পুত্র হইবে, কন্যা হইবে না। সে রবিকাকার মত তেমন হাস্যরসপ্রিয় হইবে না, রবিকাকার অপেক্ষা গম্ভীর হইবে। যে সমাজের কার্য্যে ঘুরিবার অপেক্ষা দূরে দূরে একাকী অবস্থান করিয়া ঈশ্বরের ধ্যাণে নিযুক্ত থাকিবে।'

হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবিষ্যৎবাণীর প্রথম দুটো বাক্য সত্য প্রমাণিত হলেও আমাদের সৌভাগ্য শেষের বাক্যটি মেলেনি। রথীন্দ্রনাথ সামাজিক জীব না হয়ে আরণ্যক ঋষি হলে আমরা স্থপতি, চিত্রশিল্পী, চারুশিল্পী, উদ্যানবিদ, সাহিত্যিক, সর্বোপরি 'রবি রথের সারথি'-কে পেতাম না। কৃষি ও শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদানের সমন্বয় রথীন্দ্রনাথের মত খুবই কম ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। রথীন্দ্রনাথের শিল্পীমন গঠনের পিছনে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাটক ও কাব্যচর্চার জমজমাট পরিবেশের অবদান তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় স্বীকার করেছেন – 'এই বাড়িকে কেন্দ্র করেই ভারতের শিল্প ও সাহিত্য তখন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করেছে।' বিশ্বভারতীর কর্মীমণ্ডলীর এক সভায় নিজের কথা বলতে গিয়ে রথীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন – 'জন্মেছি শিল্পীর বংশে, শিক্ষা পেয়েছি বিজ্ঞানের, কাজ করেছি মুচির আর ছুতোরের।' নিজেকে আজীবন তিনি অকিঞ্চনরূপে বর্ণনা করে গেলেও আমরা জানি তাঁর 'মুচি' আর 'ছুতোরের' কাজের কি বিপুল মাহাত্ম্য।

হয়ে ওঠার সকাল

ইংরেজিতে একটা কথা আছে – Morning shows the day। এক বর্ষণমুখর দিনে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন ভাবী শিল্পীর জীবনের morning। রথীন্দ্রনাথ তখন নিতান্তই চার বছরের শিশু। এক প্রবল বর্ষণদিনে কবির নবাবিষ্কার : '... এই ঘোরতর বিপ্লবের সময়ে আমার পুত্রটি উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেলিঙের মধ্যে তাঁর ক্ষুদ্র অপরিণত নাসিকাটি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে নিস্তব্ধভাবে এই ঝড়ের আঘ্রাণ এবং আস্বাদ গ্রহণে নিযুক্ত আছেন। শেষে বৃষ্টি পড়তে লাগল আমি খোকাকে বললুম, 'খোকা তোর গায়ে জলের ছাট লাগবে। এইখানে এসে চৌকিতে বোস' – খোকা তার মাকে ডেকে বললেন, 'মা তুমি চৌকিতে বোসো, আমি তোমার কোলে বসি', বলে মায়ের কোল অধিকার করে নীরবে বর্ষাদৃশ্য সম্ভোগ করতে লাগল। খোকা যে চুপচাপ ঘরে বসে কী ভাবে এবং আপনমনে হাসে এবং মুখভঙ্গি করে এক এক সময়ে তার আভাস পাওয়া যায়।' খোকা ওরফে রথীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে পরিতোষ প্রাপ্তির মধ্যে যে শৈল্পিক বীজ নিহিত ছিল তা যে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায়নি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

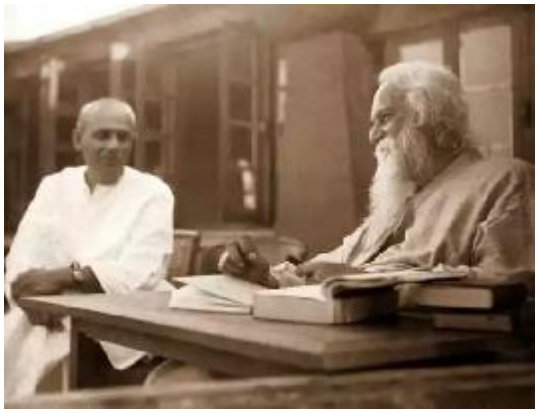

আছে আমার ছবি

আর্টের একটা দিক প্রবন্ধে 'ফুল আঁকা' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রথীন্দ্রনাথ এক গূঢ় সত্য উচ্চারণ করেছেন – 'ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে আর্টিস্ট যতক্ষণ না অভেদাত্মা হন, ততক্ষণ তাঁর সত্যিকার দেবার মতো কিছু থাকে না, তাঁর আঁকা ছবিতে সত্য ফুটে ওঠে না। কেবল তাই নয়। যিনি আর্টিস্ট, তাঁকে বাস্তব ছাড়িয়ে অধ্যাত্মজগতে দর্শকদের পৌঁছে দিতে হয়। সেই অধ্যাত্মবোধকেই আমরা শিল্পীর দৃষ্টি বলি।' রথীন্দ্রনাথের আঁকা ফুলের ছবির মধ্যে 'শিল্পীর দৃষ্টি'-র ছাপ অনুভব করা যায়। ছবি আঁকিয়ে হিসেবে রথীন্দ্রনাথের প্রথম ও প্রধান কৃতিত্ব ফুলের ছবি। সুশোভন অধিকারী সংকলিত রথীন্দ্রনাথের চিত্রপঞ্জির তালিকায় দেখা যায় তিনি ৫২টি ছবি এঁকেছেন। টেম্পেরা, জলরং, মোমরং, ক্রেয়ণ, পেনসিল, প্যাস্টেল, ওয়াশ ও টেম্পেরা, ভার্নিশের প্রলেপযুক্ত টেম্পেরা, অস্বচ্ছ জলরং ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমের আশ্রয়ে আঁকা হয়েছে এই ছবিগুলো। তাঁর আঁকা ফুলের ছবি দেখলে তা ছবি বলে মনে হয় না, মনে হয় জীবন্ত সত্ত্বা। ফুলকে তিনি দেখেছেন যত কাছ থেকে ও যত সুন্দরভাবে, তেমনি করে তিনি তাঁর তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। দেখে মনে হয় এমন রিয়ালিস্টিক ছবি আদৌ সম্ভব! শিল্পী পিতা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন তাই তাঁর প্রশংসাসূচক উক্তি – 'ওর (রথীন্দ্রনাথের) ফুলের ছবিগুলো সত্যি ভাল, এত delicate করে আঁকে। ফুলের ছবিতেই ওর বিশেষত্ব।' রথীন্দ্রনাথ যে ফুলের অন্তরে প্রবেশ

করে তার সত্যিকার রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে তা রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীর মংপুর বাড়িতে থাকাকালীন তাঁর আঁকা 'জেরবেরা' ফুলের ছবি দেখে বুঝতে পেরেছিলেন। উচ্ছ্বসিত কবি স্বীকার করে নিয়েছিলেন 'রথীর মত এত নিপুণ করে আমি ফুলের ছবি আঁকতে পারি না।' জীবনের প্রান্তলগ্নে দেরাদুনে ফুলের প্রতি তাঁর এই আদি-অকৃত্রিম ভালোবাসাই বুঝি উঠে এসেছিল শিল্পীমনের তুলিতে। ফুলের ছবির পাশাপাশি বিভিন্ন গাছ, ল্যাণ্ডস্কেপ, ফুলের টব, পাহাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য, বাগান, মাঝি, তিব্বতি মেয়ের মুখোশ রথীন্দ্রনাথের অঙ্কণশিল্পকে বিচিত্রতায় ভারিয়ে তুলেছিল। ভাবতে অবাক লাগে যাঁর রেখার গুণে ছবি এতই জীবন্ত হয়ে উঠেছে তিনি শিল্পী হিসেবে কোনো বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীতে সামিল হতে চাননি, কোনো গুরুর কাছে তালিমও নেননি। তিনি শিল্পের প্রাথমিক রীতিনীতি সহজসরলভাবে অনুসরণ করেছেন।

কারুশিল্প

মেনকা ঠাকুর তাঁর স্মৃতিচারণায় শিল্পী রথীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন – 'রথীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন চারুশিল্পীর মন নিয়ে, কিন্তু হয়ে উঠেছিলেন কারুশিল্পী।' রথীন্দ্রনাথ নিজে একে বলেছেন 'ছুতোরের কাজ'। তাঁর কারু দুনিয়াটা যখের ধনের গুহাভ্যন্তরের মত। ওখানে প্রবেশ না করলে গোটা রথীন্দ্র ব্যক্তিত্বকে আমরা আবিষ্কার করতে পারব না।' বিশ শতকের প্রারম্ভে শহরের কলকারখানার বাড়বাড়ন্তে গ্রামের শিল্পী সমাজ ভেঙে পড়েছিল সেদিন রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন শিল্পীকে মজুরে পরিণত করা হচ্ছে। গ্রামকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখতেন তা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে হাতে কলমে কারুশিল্পের কাজ বিশ্বভারতীতে প্রথম শুরু হয় প্রতিমাদেবীর উদ্যোগে ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনের কলাভবন চত্বরে। পরে সুনির্দিষ্ট কারণে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮ সালে এই চর্চাকে সরিয়ে শ্রীনিকেতন রেল কোম্পানীর এক পরিত্যক্ত বড়ো চালাঘরকে সারাই করে *হল অফ ইন্ডাস্ট্রি* নাম দিয়ে স্থানান্তরিত করেন এবং রথীন্দ্রনাথের উপর বিশ্বভারতীর গ্রামীণ শিল্পবিভাগটির গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। বস্তুত তাঁরই সুযোগ্য নেতৃত্বে গড়ে ওঠে শিল্পভবনের মজবুত ভিত এবং মূলত তাঁরই উদ্যোগে এদেশে সর্বপ্রথম জাতি-ধর্ম ভেদাভেদ উপেক্ষা করে গ্রামে গ্রামে প্রশিক্ষিত কারুশিল্পী নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন শিল্পে হাতেকলমে কাজ শেখানোর চেষ্টা শুরু হয়। রথীন্দ্রনাথ কারুশিল্পের দীক্ষা পেয়েছিলেন জাপানের কাছ থেকে। ১৯২৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি এই বিভাগটির কর্ণধার ছিলেন। মূলত রথীন্দ্রনাথের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে 'শিল্পভবন' একটি সার্থক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে

পরিণত হয় এবং ভারতবর্ষের কারুশিল্পের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। ধীরে ধীরে শ্রীনিকেতনের পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষদের নিকট শিল্পভবন রুজি-রোজগারের এক আকাঙ্খিত কর্মস্থল হয়ে ওঠে। আজকে যখন দেখি বাটিক শিল্প, সৌন্দর্যমন্ডিত চর্মশিল্প, স্থানীয় মৃত্তিকা নির্মিত গ্লেজ-পটারি ইত্যাদি নতুন নতুন ডিজাইনের হ্যান্ডলুম শাড়ি, বেডকভার, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, দরজা-জানালার পর্দা, মোড়া, বাঁশ, বেত, গালার কাজ, সৌখিন চামড়ার ব্যাগ, বাটিকের চাদর, পোড়ামাটির কাজ তখন মানসপটে ভেসে ওঠে রথীন্দ্রনাথ। এই সমস্ত জিনিসে যেন রথীন্দ্রনাথের হাতের স্পর্শ লেগে আছে। ভারতীয় কারুশিল্পে দেশ বিদেশে খ্যাত ও চাহিদাযুক্ত 'শান্তিনিকেতনী রীতি' প্রবর্তন করার মূলে ছিলেন শিল্পী ডিজাইনার রথীন্দ্রনাথ।

চামড়ার কাজ

'মুচিশিল্প'-কে কেউ যদি ভারতবর্ষে আমদানি করার দাবি করে থাকেন তবে তিনি রথীন্দ্রনাথ। 'আজকে চামড়ার কাজ ভারতবর্ষ জুড়ে চলেছে, কিন্তু অনেকেই জানেন না যে এই শিল্প রথীদাই প্রথম বিদেশ থেকে শিখে এসে প্রচলন করেছিলেন' – মৈত্রেয়ী দেবীর এই বক্তব্যের সাথে সহমত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাণী চন্দ, বীরভদ্র রাওচিত্র। ১৯২৪ সালে ইউরোপ ভ্রমনই এর অনুপ্রেরণা। রাণী চন্দ তাঁর *সব হতে আপন* বইতে জানাচ্ছেন – 'স্বামী-স্ত্রী বিদেশে কিছুদিন থেকে এই ক্রাফট অতি যত্নের সঙ্গে শিখে এসেছিলেন। উত্তরায়ণের জাপানি ঘরের লাগা দক্ষিণের বারান্দায় বৌঠান-রথীদা আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে চালু করলেন এই কাজ।' চর্মশিল্প কাজে রথীন্দ্রনাথের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এই কাজে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিল্পকাজের ছাপ আনতে সক্ষম হন। চামড়াকে ট্যানিং করে তার ওপর ছবি ও নকশা মিলিয়ে কত না রঙে সাজিয়ে দৈনন্দিন শিল্প গড়ে তুললেন। হাতব্যাগ, ফাইল, ফোলিয়ো ব্যাগ, লেদার কেস, বাক্স – কত রকমের জিনিস গড়ে তুললেন। চামড়া শিল্পকে ডিজাইন প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করে ব্যাপকভাবে বিপনন ব্যবস্থা গড়ে উঠল। এই কাজে স্থানীয় কারুশিল্পীরা উপকৃত হল। বিক্রি থেকে ভালো রোজগার এল। স্বনির্ভরতার আশা জেগে উঠতে লাগল। শান্তিনিকেতন ডিজাইন দেশে বিদেশের বাজারে ছড়িয়ে পড়ল। স্থানীয় চর্মশিল্পীদের সুবিধার্থে শিল্পসদন ও স্থানীয় চর্মশিল্পী গোষ্ঠীবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে রথীন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত 'শান্তিনিকেতনী চর্মশিল্প' গত ২০০৭-২০০৮ সালে ভারত সরকারের বিশেষ স্থানাঙ্কিত সম্পদ স্বরূপ ভৌগোলিক চিত্র (Geographical Identification) ব্যবহারের স্বীকৃতি আনানো একটি যুগান্তকারী ঘটনা। চর্মশিল্প আর বাটিক শিল্পের প্রবর্তক হিসাবে তাঁর কাছে এদেশ ঋণী রইবে চিরকাল।

আসবাবপত্র ও কাঠের কাজ

রবীন্দ্রনাথ *দেশীয় রাজ্য*-তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন '... বিলাতি আসবাবখানার নিতান্ত ইতরশ্রেণীর সামগ্রীগুলি ঘরে সাজাইয়া আমাদের দেশের বড়ো বড়ো রাজারা নিতান্তই অশিক্ষা ও অজ্ঞতাবশতই গৌরব করিয়া থাকেন।' উপযোগিতা ও সৌন্দর্য সাধনার ফসল সুলভে মানুষের নাগালের মধ্যে এনে দিয়ে একজন সার্থক ডিজাইনারের কাজ করে রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রক্ষোভ প্রশমিত করলেন। রথীন্দ্রনাথই প্রথম শিল্পসম্মত, সহজ-সরল অন্দরসজ্জা ও আসবাবপত্রের উৎপাদন ও বিস্তৃত প্রসারণের মাধ্যমে বিশ শতকে দেশের ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্ত থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে আসবাবপত্রের সৌন্দর্য এনে হাজির করলেন। শুধু তাই নয়, আজকে যে স্থানসংকোচনশীল আসবাবপত্র লভ্য, তা এদেশে প্রথম চালু করেন রথীন্দ্রনাথই। ১৯২৫ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যকালীন সময়ে শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণ চত্বরে নির্মিত গৃহগুলি এবং ঐ গৃহগুলির প্রয়োজনে নির্মিত আসবাব ও অন্দরসজ্জাগুলি মূলত রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর দক্ষিণহস্ত সুরেন কর মহাশয়ের মস্তিষ্কপ্রসূত। চিত্রভানুতে, কোণার্কে, উদয়নে স্নানঘর ও স্নানঘর সংলগ্ন আসবাব-স্থাপত্য যখন নির্মাণ করলেন তখন ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর ফুল ও প্রকৃতিমুখী জ্যামিতিক ডিজাইন নতুন আস্বাদে ফিরে এল। আসবাবপত্রে জ্যামিতিক ছন্দের সঙ্গে ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর মিশেলের প্রমাণ উদয়নের বসবার ঘর, খাওয়ার, শোওয়ার ঘর, পাশে বিশ্রামের জায়গা। বুদ্ধদেব বসু উদয়ন দেখে মুগ্ধ হয়ে *সবপেয়েছির দেশে*-তে লিখেছেন 'এই আসবাবপত্রগুলির বিশেষত্ব প্রথম দর্শনেই চোখে ঠেকে এবং এখানে তুচ্ছ-জ্ঞান কোনো প্রয়োজনের জিনিস দেখলাম না যা সুন্দর নয় ...'

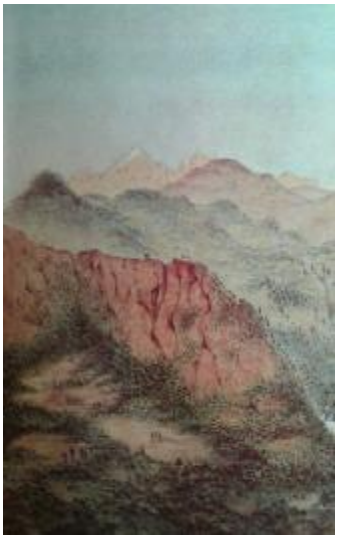

কাঠের কাজ রথীন্দ্রনাথের প্রাণের সম্পদ। আজীবনই নিজের হাতে কাঠের কাজ করে গেছেন তিনি। কাঠের জাত, কাঠের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর খুব ভাল ধারণা ছিল। যেমন কোন কাঠে কোন জিনিস ভাল দেখাবে, কোন কাঠে কোন ডিজাইন ভাল খুলবে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। কাঠের inlay ও কাঠের আসবাবপত্র যেমন চেয়ার, টেবিল, আলমারি ইত্যাদি তিনি খুব ভাল তৈরী করতে পারতেন।

বাড়ি নির্মাণ

রথীন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর একজন আর্কিটেক্ট ছিলেন অথচ ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা নিয়ে তিনি কখনও পড়েননি। এটা তাঁর সহজাত গুন। নানারকম বাড়ির ডিজাইন করা তাঁর অন্যতম

হবি ছিল। আর্কিটেক্ট রথীন্দ্রনাথের শিল্পীমনের পরিচয় বহন করে শান্তিনিকেতনের বাড়িগুলো। রথীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ করের সাথে শান্তিনিকেতনে যে ছোটো ছোটো হস্টেল এবং বাসগৃহের পরিকল্পনা করেছিলেন তার বিশেষ একটা চরিত্র ছিল। স্থপতি রথীন্দ্রনাথের এই দিকটি সুন্দরভাবে ধরা দিয়েছে অ্যান্ড্রুশ সাহেবের কলমে – 'Rathi is writing poetry in bricks and mortar.'। স্থাপত্যকাজে এদেশে সর্বপ্রথম রথীন্দ্রনাথই আধুনিক ভারতীয় রীতি উদ্ভাবন করার উদোগ নেন। তাঁর 'উদয়ন' বাড়িটির তুলনা বোধহয় কোথাও নেই। উদয়নকে আশ্রমবাসীরা অনেকেই সুনজরে দেখেননি। ব্যঙ্গ করে তারা বলতেন রাজবাড়ি। কিন্তু তিনি ছিলেন সৌখিন স্বভাবের। তিনি গৃহ নির্মাণ শিল্পের একটি সুরম্য নিদর্শন হিসাবেই গৃহটি নির্মাণ করেছিলেন। উদয়ন গৃহ যে রথীন্দ্রনাথের ভোগলিপ্সার চেয়ে সৌন্দর্য লিপ্সার প্রকাশ তা স্যার মরিস গয়ারের চোখ এড়ায়নি। মরিস গয়ার উদয়নে খুঁজে পেয়েছেন 'There is thought in every corner'। নন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথায় দেখতে পাওয়া যায় রতনপল্লীতে 'ছায়ানীড়' বাড়িটির সমস্তকিছু পরিকল্পনা রথীন্দ্রনাথের। জাপানী কায়দায় নির্মিত উদয়নের বাগানে প্রতিমাদেবীর জন্য নির্মিত স্টুডিও চিত্রভানুর একতলায় রথীন্দ্রনাথের নিজের ওয়ার্কশপ গুহাঘরও তাঁর স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন।

১৯৫৩ সালে বিশ্বভারতীর উপাচার্যপদ ত্যাগ করে রথীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেন দেরাদুনে। রাজপুরে 'মিতালি' গড়ে তুললেন। এই মিতালিকে দেখলেই সহজে বোঝা যায় মিতালি হল উদয়নের পুনশ্চ বা postscript। মিতালির বসার ঘরে সবখানেই উদয়নের ছোঁয়া।

উদ্যানচর্চা

বাগান করা অভিজাতদের অন্যতম শখ। কিন্তু এক্ষেত্রে রথীন্দ্রনাথের শখ ও নেশা অভিজাত বন্ধুদের থেকে ভিন্ন ছিল। রসিক ও বিজ্ঞানীর এক অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সঠিক মূল্যায়ণ করেছেন – 'রথীন্দ্রনাথের মেজাজটা ছিল বিজ্ঞানীর, মনটা ছিল আর্টিস্ট বা ভাবুকের'। শিল্পী রথীন্দ্রনাথকে যেমন পাওয়া যায় উত্তরায়ণের অট্টালিকায়, তেমনি তাঁর শৈল্পিক স্পর্শ লেগে আছে তাঁর নির্মিত উদ্যানে। সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'কোলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর পরে সংগ্রহ বৈচিত্র্যে দেশের যে কটি ছোটখাটো উল্লেখযোগ্য উদ্যান আছে শান্তিনিকেতন সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।' স্বদেশ-বিদেশ, জংলি-পাহাড়ি শৌখিন, বুনো এবং পোশাকি নিত্যনতুন ফুলগাছের পারস্পরিক সম্মিলন (hybrid) নিয়ে সারাজীবন ধরেই তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং সন্তানস্নেহে তাঁদের লালন-পালন করেছেন। তাদের নিত্যনতুন অভিব্যক্তি তাঁকে হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, মাতিয়েছে। এরা তাঁর হৃদয় জুড়ে বসেছিল। এদের সাথে নিত্য চলত তাঁর ভাব-বিনিময়, অব্যক্ত কথার মাধ্যমে হৃদয়ের

আদানপ্রদান। গাছেদের সাথে আজন্ম একটা সংবেদনশীল বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন তিনি, সেই বক্তব্য কবিকন্যা মাধুরীলতার শিলাইদহে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট – 'রথী কি সেখানে গিয়ে কোনো Fern কী অন্য গাছপালা দিয়ে বাগান করেছে? এখন ওর দু'একটা গাছ ছাড়া সব মরে গেছে, ওকে বলো না ওর ভয়ানক কষ্ট হবে।'

শান্তিনিকেতনের কঙ্করময় জমিতে গোলাপ গাছ হতনা বললেই চলে। সেই জমিতে গোলাপবাগান করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথের সেই দুঃসাধ্যসাধন দেখে প্রত্যক্ষদর্শী গোলাপপ্রেমী কবির সন্তুষ্ট উচ্চারণ – 'রথী, আমি জীবনে কখনই ভাবতে পারিনি এখানে গোলাপ ফুল দেখব। তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করেছ।'

জীবনের উপান্তে দেরাদুনে উত্তরায়ণেরই মতো আশ্চর্যরকমের এক বাগান করেছিলেন তিনি। নানারকম ফুল ও ফলের গাছ ছিল। জুঁই, চামেলী, বেলি গন্ধরাজ ইত্যাদির সাথে সাথে তাঁর বাগানের শোভাবর্দ্ধন করেছিল বিদেশী ফুল জ্যাকাবান্ডা, বটলব্রাশ, অ্যাজেলিয়া, অ্যাকালিয়া, ম্যাগনোলিয়া। প্রত্যক্ষদর্শী ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা তার সাক্ষ্যবহন করে। 'তাঁর বাগানে অত্যাশ্চর্য রকমের ফুল-ফল ধরত। বিদেশী ফুলের ইয়াত্তা নেই। তাঁর সত্যই green hand ছিল।

শুধুমাত্র কারুশিল্প, চিত্রাঙ্কণ, স্থাপত্যবিদ্যা, উদ্যানবিদ্যা, চর্মশিল্পতে রথীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পমনের অনুশীলন ও অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, তাঁর উদ্যোগে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের লালবাড়িতে 'বিচিত্রা' ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয় ১২ জুলাই ১৯১৫। চিত্রকলায় বেঙ্গল স্কুলের বিকাশে এই ক্লাব বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। রন্ধনশিল্পে উৎসাহ ছিল, নানারকম আচার প্রস্তুতিতে তাঁর দক্ষতার কথা নানাজনের স্মৃতিচারণায় স্পষ্ট। প্রসাধনী দ্রব্য ও গন্ধদ্রব্যও বানাতে পারতেন। শেষ দিকে Arty Perfumes বলে কিছু প্রসাধনী দ্রব্য বাজারে ছেড়েছিলেন, ফটোগ্রাফি ছিল তাঁর চর্চা ও আগ্রহের ক্ষেত্র। তাঁর তোলা আলোকচিত্রের একটা বড়ো অংশ architectural photography-র পর্যায়ভুক্ত। Boat-Architecture-কে বিশ্বমানের করে তোলাটা ছিল রথীন্দ্রনাথের কর্মপরিণতি। বাহন এবং বাহকের সম্পর্কের সুতোকে মজবুত করতেই যেন রথীন্দ্রনাথ বিংশ শতকের তিনের দশকে চালু করলেন ইঞ্জিনচালিত বোট-স্থাপত্য। শিল্পের নানাদিকে ছিল তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ তবুও তিনি নিজেকে craftsman ভাবতেন, artist নয়। তিনি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন 'নিরহং শিল্পী'। শঙ্খ ঘোষ বলেছেন – 'শিল্পী শব্দটির তাৎপর্য বহুদূর প্রসারিত হতে পারে। চলচ্চিত্রের, সংগীতের, নাট্যের, চিত্রের, ভাস্কর্যের, সাহিত্যেরই নয়, শিল্পী কেউ হতে পারেন জীবনেরও, যাপনেরও।' রথীন্দ্রনাথের মতো মানুষের কর্ম

যেমন তাঁর শিল্পীসত্ত্বার পরিচয় বহন করে, তেমনি তাঁর জীবনযাপনও শৈল্পিক। শিল্প তাঁর কর্মে এবং মননে।

এল্ মহাস্ট লিখেছেন – 'অভিজাতসুলভ তাঁর শান্ত মুখশ্রীর অন্তরালে ছিল শিল্পীর হৃদয়, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করবার সময়-সুযোগ তিনি কদাচিৎ পেয়েছেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা, বিশ্বভারতীর নানা আর্থিক ও আইনগত প্রশ্নের আলোচনায় তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তাঁর স্টুডিও, তাঁর ছোটো কারখানা ঘর বা তাঁর উদ্যানচর্চার কাজে দেবার সময় তিনি সামান্যই পেয়েছেন।' আসলে রথীন্দ্রনাথের জীবনে আবেদনের চেয়ে নিবেদন শিল্পই যেন বেশি। নানাসময় নানা কাজে পিতার ইচ্ছার কাছে আত্মবলি দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর একজন বড়োমাপের 'কেয়ারটেকার'-ই থেকে যেতে হয় তাঁকে। নীরব কর্মেই ছিল তাঁর আশক্তি ও মাহাত্ম্য। চিরজীবন তিনি উইংসের আড়ালেই রয়ে গেছেন, স্টেজে নামবার আকাঙ্খা প্রকাশ করেননি। তিনি 'কর্মের উচ্চ দাম' দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মতো 'কর্মীর নাম নেপথ্যেই' রয়ে গেছে। সত্যজিৎ রায় বলেছেন – 'শিল্পীরা সবসময় এক পথে চলতে ভালোবাসে না।' জীবনের উপান্তে রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী ত্যাগ করে আকস্মিকভাবে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নেন দেরাদুনে। কেউ বলেছেন ভুল বোঝাবুঝি, কেউ বলেছেন সরকারি নিয়মের বাঁধন ভালো লাগেনি, কেউ বলেছেন অবকাশ যাপনের আকাঙ্খা। কিন্তু কেউ বলেননি পিতার ছায়া থেকে দূরে 'নিজের জীবন' কাটাবার সে ছিল প্রয়াস। চিরকাল নেপথ্যচারী মানুষটির মৃত্যুও ঘটেছে জনতার দৃষ্টির আড়ালে। পিতার জন্মশতবর্ষের বিপুল কোলাহলের আড়ালে সহজেই চাপা পড়েছে কবিপুত্রের মৃত্যু সংবাদটি। এমনভাবে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারাও কি আর্ট নয়?

গ্রন্থঋণ স্বীকার : ১। রথীন্দ্ররচনাবলী; ২। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্মশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা; ৩। Rathindranath Tagore : The Unsung Hero, Ed. By Tapati Mukhopadhyay and Amrit Sen; ৪। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সাহিত্যপত্র : রথীন্দ্র জন্মশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা; ৫। অন্য ঠাকুর : মাতৃশক্তি : ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; ৬। আপনি তুমি রইলে দূরে – নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়; ৭। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর – অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়; ৮। নিরহং শিল্পী – শঙ্খ ঘোষ; ৯। সব হতে আপন – রাণী চন্দ।